Rajshahi University journal of arts & law **ISSN 2309-0898 (Print)**
Vol. 54, Issue 1 (2026), pp. 139-153 **ISSN 2408-8773 (Online)**
DOI: https://doi.org/10.64102/rujal.0732

মুয়াবিয়ার খিলাফতে বৈদেশিক সম্পর্ক: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
[Foreign Relations in the Caliphate of Muawiyah: A Historical Review]

মো. হাসান রেজা*

Abstract

Hazrat Muawiyah (RA.) was one of the rulers in the history of the world who is remembered for his own merits. He set a unique example of valor, bravery and courage. In spite of being a controversial and extravagant ruler, his personal life remained incorrupted. Muawiyah ibn Abu Sufzan (RA.) ruled as the first Umayyad Caliph of Islam from 661 to 680 AD. regardless of the methods he adopted to seize power, historians have recognized him as an experienced ruler, a skilled diplomat and a fearless warrior. He became a caliph of Damascus and this initiated the concept of monarchy in the history of Islam. During his reign, a well-organized and policy strategy was followed in foreign relations. He focused on expanding the boundaries of the Islamic Caliphate as well as showing skill in establishing good foreign relations with the Byzantine Empire, North Africa, Transoxiana in Central Asia, Khorasan and other neighboring powers. Not only was his Caliphate consolidated but also extended both regionally and internationally. This policy helped him to lay the foundation of the Umayyad Caliphate. This paper attempts to highlight the key aspects of foreign relations during his caliphate.

Keyword : Hazrat Muawiyah, Muawiyan caliphate, Foreign policy, Central Asia, North Africa.

ভূমিকা

৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের খিলাফতে আরোহণ ইসলামী শাসনব্যবস্থা এবং বৈদেশিক নীতিতে একটি নতুন যুগের সূচনা চিহ্নিত করে। এ প্রসঙ্গে ''Cambridge History of Islam''- গ্রন্থে বলা হয়ছে, For the islamic empire, Muawiyah accession to power marked the beginning of twenty year of internal,prosperity and military conquests.[১] প্রথম ফিতনার (৬৫৬-৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ) অস্থির সময় এবং আলী ইবনে আবু তালিবের হত্যাকাণ্ডের পর মুয়াবিয়া ইসলামী সম্প্রদায়ের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন এবং দামেস্কে রাজধানী স্থাপন করে উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। তার বিশ বছরের শাসনকাল মধ্যযুগীয় মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক দৃশ্যপট গঠনে এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ইসলামী বৈদেশিক সম্পর্কের পরিমিতি নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা প্রমাণিত হয়। মুয়াবিয়ার বৈদেশিক নীতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ঐতিহ্যবাহী আরব কূটনৈতিক অনুশীলন, ইসলামী ধর্মীয় নীতি এবং বাস্তববাদী রাজনৈতিক বিবেচনার একটি অনন্য মিশ্রণ দ্বারা চিহ্নিত। তার পূর্বসূরিদের থেকে ভিন্ন যারা প্রাথমিকভাবে দ্রুত আঞ্চলিক সম্প্রসারণ এবং ধর্মীয় সংহতির উপর মনোনিবেশ করেছিলেন। মুয়াবিয়া প্রতিবেশী শক্তিগুলির সাথে স্থিতিশীল সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছিলেন এবং একইসাথে কৌশলগত সম্প্রসারণ অনুসরণ করেছিলেন। তার বৈদেশিক নীতির উদ্দেশ্য একাধিক মাত্রা অন্তর্ভুক্ত করেছিল: ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা সুরক্ষিত করা, প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যগুলি থেকে সম্ভাব্য হুমকি নিরপেক্ষ করা, আরব গোত্রীয় সংঘগুলোর সাথে সম্পর্ক পরিচালনা করা এবং অভ্যন্তরীণ মতভেদ

* প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী ৬২০৬, বাংলাদেশ; E-mail: hassanreza510@gmail.com

মোকাবেলা করা যা তার কর্তৃত্বকে দুর্বল করতে পারে। মুয়াবিয়ার বৈদেশিক সম্পর্কের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছিল সামরিক বিজয় বা কূটনৈতিক চুক্তির চেয়ে বিস্তৃত। তার শাসনামলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সুবিধাজনক করার জন্য পরিশীলিত প্রশাসনিক কাঠামোর উদ্ভব, বাইজেন্টাইন নৌ আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করা একটি পেশাদার নৌবাহিনী উন্নয়ন এবং ইসলামী ধর্মীয় নীতির সাথে ব্যবহারিক রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তার ভারসাম্য রক্ষাকারী কূটনৈতিক প্রোটোকল প্রতিষ্ঠার সাক্ষী ছিল। এই উদ্ভাবনগুলি ইসলামী সম্প্রদায়কে প্রাথমিকভাবে আরবীয় ঘটনা থেকে একটি প্রধান আন্তর্জাতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হবে যা বিভিন্ন সভ্যতার সাথে টেকসই মিথস্ক্রিয়া করতে সক্ষম ছিল। তিনি শুধুমাত্র সামরিক শক্তির ওপর নির্ভর না করে কূটনীতি, বাণিজ্য এবং রাজনৈতিক জোট তৈরির মাধ্যমে ইসলামিক রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করেন। তার শাসনামলে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য, সাসানীয় সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ, উত্তর আফ্রিকার বার্বার উপজাতিসমূহ এবং মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যের সাথে জটিল সম্পর্ক গড়ে ওঠে।[২] এই প্রবন্ধটি ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়েছে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং ক্ষমতায় আরোহণ

৬৬১-৬৮১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইসলামি রাষ্ট্র একটি স্থিতিশীল ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। P.K. Hitti says that- "He abolished many traditional features of the government and on the earlier Byzantine famework built a stable, well organised state"।[৩] মুয়াবিয়ার শাসনকালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল তার বৈদেশিক নীতি ও কূটনীতি। একজন দক্ষ রাজনীতিবিদ ও কৌশলবিদ হিসেবে তিনি ইসলামিক রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক অবস্থানকে শক্তিশালী করেন এবং বিভিন্ন প্রতিবেশী শক্তির সাথে জটিল সম্পর্ক পরিচালনা করেন। মুয়াবিয়ার বৈদেশিক নীতির বিশেষত্ব ছিল তার বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি শুধুমাত্র সামরিক শক্তির ওপর নির্ভর না করে কূটনীতি, বাণিজ্য এবং রাজনৈতিক জোট তৈরির মাধ্যমে ইসলামিক রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করেন। মুয়াবিয়ার বৈদেশিক নীতি বুঝতে হলে তার ক্ষমতায় আরোহণকে রূপদানকারী ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও তিনি যে চ্যালেঞ্জগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন সেগুলি পরীক্ষা এবং আলোচনা করা অপরিহার্য। ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর মৃত্যুর পর খুলাফায়ে রাশেদিনের খলিফাদের অধীনে দ্রুত সম্প্রসারণের এমন একটি পর্যায়ের সূচনা করেছিল যেখানে মুসলিম বাহিনী লেভান্ট, মেসোপটেমিয়া, মিশর এবং পারস্যের বিস্তৃত অঞ্চল জয় করেছিল। এই সম্প্রসারণ উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জও সৃষ্টি করেছিল বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর একীকরণ এবং অবশিষ্ট অ-ইসলামী শক্তিগুলির সাথে সম্পর্ক পরিচালনার বিষয়ে। মুয়াবিয়ার রাজনৈতিক কর্মজীবন উমর ইবনুল খাত্তাবের খিলাফতকালে শুরু হয়েছিল যিনি ৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে তাকে সিরিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন।[৪] এই নিয়োগটি দূরদর্শী প্রমাণিত হয়েছিল কারণ সিরিয়ার তিনটি মহাদেশের সংযোগস্থলে কৌশলগত অবস্থান ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের নিকটবর্তিতা মুয়াবিয়াকে সামরিক বিষয় এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপক অভিজ্ঞতা প্রদান করেছিল। গভর্নর হিসেবে তার ২২ বছরের শাসনকালে মুয়াবিয়া অসাধারণ প্রশাসনিক দক্ষতা,কূটনৈতিক দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন এবং সীমান্তে আপেক্ষিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে পূর্বতন বাইজেন্টাইন অঞ্চলগুলোকে ইসলামী রাষ্ট্রে একীভূত করার জটিল প্রক্রিয়া সফলভাবে পরিচালনা করেছিলেন। প্রথম ফিতনার যুদ্ধ মুয়াবিয়ার জন্য সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জ উভয়ই তৈরি করেছিল। সর্বাধিক শক্তিশালী প্রাদেশিক গভর্নর এবং নিহত খলিফা উসমানের চাচাত ভাই হিসেবে মুয়াবিয়া আলীর কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য প্রয়োজনীয় বৈধতা এবং সম্পদ উভয়ই ছিল। আলীর খিলাফত স্বীকার করতে তার অস্বীকৃতি এবং উসমানের হত্যার জন্য বিচারের দাবি কেবল তার ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয় বরং ইসলামী শাসনের স্থিতিশীলতা এবং বৈধতা সম্পর্কে প্রকৃত উদ্বেগকেও প্রতিফলিত করেছিল। সিফফিনের যুদ্ধ (৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দ) এবং

পরবর্তীতে "দুমাতুল জান্দালের" সালিশি (Arbitration of Dumat al-Jandal- ৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে) প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে সামরিক সমাধানের চেয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের প্রতি অগ্রাধিকার প্রদর্শন করেছিল যা তার পরবর্তী বৈদেশিক নীতির পদ্ধতিকে সংজ্ঞায়িত করে।[৫] ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে আলীর হত্যাকাণ্ড মুয়াবিয়ার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিষ্কাশন করে এবং তাকে তুলনামূলক বিস্তৃত সমর্থন নিয়ে খিলাফত গ্রহণ করতে সক্ষম করে। ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে মুয়াবিয়ার ক্ষমতায় আরোহণ নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছিল বিশেষত, আলীর সমর্থকদের আনুগত্য এবং ইসলামী বিশ্ব জুড়ে তার বৈধতা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে। এই অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জগুলি তার বৈদেশিক নীতির অগ্রাধিকারগুলিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করবে কারণ বাহ্যিক হুমকিগুলি সম্ভাব্যভাবে অভ্যন্তরীণ বিরোধিতার জন্য সমাবেশের বিন্দু প্রদান করতে পারে যখন সফল বিদেশী উদ্যোগগুলো তার প্রতিপত্তি এবং বৈধতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করেছিল ।

মুয়াবিয়ার সাথে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বৈদেশিক সম্পর্ক

মুয়াবিয়ার বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের শাসকদের সাথে পারস্পারিক সম্পর্ক অধিক সুদৃঢ় হয়েছিল। প্রধান খ্রিষ্টীয় শক্তি এবং ইসলামী সাম্রাজ্যে সম্প্রসারণের ঐতিহ্যবাহী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে ইসলামী নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে বড় বাহ্যিক হুমকি এবং ইসলামী বিজয়ের জন্য সর্বাধিক প্রতিপত্তিশালী লক্ষ্য উভয়কেই প্রতিনিধিত্ব করেছিল। বাইজেন্টাইন সম্পর্কে মুয়াবিয়ার আক্রমণাত্মক পদ্ধতি সম্প্রসারণ এবং বাস্তববাদী মিলনের মধ্যে একটি সতর্ক ভারসাম্য দ্বারা চিহ্নিত ছিল যা ইসলামী ধর্মীয় অপরিহার্যতা এবং ব্যবহারিক রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতা উভয়ের প্রতি তার বোধগম্যতা প্রতিফলিত করেছিল। এ উদ্দেশ্যে নিপুন পরিকল্পনার ও ছক তৈরি করেন যা সামনে রেখে তিনি আজীবন সফলভাবে তাদের মোকাবেলা করে গেছেন তেমনি তার পরবর্তী খলিফাগণ একই পথে হেটে সফলতা অর্জন করেছেন লক্ষ্যসমূহের মধ্যে তার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাদের রাজধানী কনস্ট্যান্টনোপাল বিজয়।[৬] চতুর্থ কনস্ট্যান্টাইন (৬৬৮-৬৮৫ খ্রি.) এর অধীনে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য একাধিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল যার সুযোগ মুয়াবিয়া দ্রুত কাজে লাগাতে পারেন এবং অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় বিতর্ক মনোথেলাইট বিরোধ সাম্রাজ্যিক ঐক্যকে দুর্বল করে দিয়েছিল যা বলকানে স্লাভিক জনগণের চাপ বাইজেন্টাইন সামরিক সম্পদকে প্রসারিত করেছিল। পূর্ববর্তী ইসলামী সাম্রাজ্যে বিজয়ে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন এবং মিশরের ক্ষতি বাইজেন্টাইন রাজস্ব এবং জনবল মারাত্মকভাবে হ্রাস করেছিল যা টেকসই সামরিক প্রতিরোধের জন্য সাম্রাজ্যের সক্ষমতা সীমিত করেছিল। মুয়াবিয়ার বাইজেন্টাইন নীতি বেশ কয়েকটি স্বতন্ত্র পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে, তিনি বার্ষিক অভিযানের (গাজু) মাধ্যমে ক্রমাগত চাপের একটি কৌশল অনুসরণ করেছিলেন যা একাধিক উদ্দেশ্য পূরণ করেছিল তা হলো তার সৈন্যদের জন্য লুটের মাল এবং সামরিক অভিজ্ঞতা প্রদান করেছিল যা জিহাদের প্রতি ইসলামী প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করেছিল এবং ক্রমান্বয়ে বাইজেন্টাইন সীমান্ত প্রতিরক্ষা দুর্বল করেছিল। এই অভিযান গুলো সাধারণত গ্রীষ্মকালে পরিচালিত হতো যা এতটাই নিয়মিত হয়ে উঠেছিল যে বাইজেন্টাইন সূত্রগুলি তাদের প্রায় একটি ঋতুগত ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করে। এই অভিযানগুলির লক্ষ্যগুলো প্রধান সামরিক সংঘর্ষের ঝুঁকি কমিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষতি সর্বাধিক করার জন্য সতর্কভাবে নির্বাচিত করা হয়েছিল। মুয়াবিয়ার বাইজেন্টাইন নীতির সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী পর্যায় ছিল কনস্ট্যান্টিনোপলের উপর দীর্ঘাদিন অবরোধ (৬৭৪-৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দ) যা বাইজেন্টাইন রাজধানী দখলের জন্য প্রথম গুরুতর ইসলামী প্রচেষ্টার প্রতিনিধিত্ব করেছিল।[৭] এই অভিযানে মুয়াবিয়ার কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইসলামী প্রতিপত্তির জন্য কনস্ট্যান্টিনোপলের দখলের প্রতীকী গুরুত্বের প্রতি তার বোধগম্যতা উভয়ই প্রদর্শন করেছিল। অবরোধ স্থল এবং নৌবাহিনীর মধ্যে পরিশীলিত সামরিক সমন্বয় জড়িত ছিল যা মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে ইসলামী সামরিক সক্ষমতার বিকাশ প্রতিফলিত করেছিল। তবে

কনস্ট্যান্টিনোপল অবরোধের ব্যর্থতা পরিশীলিত নগর দুর্গ এবং উন্নত নৌ-প্রযুক্তির মুখোমুখি হলে ইসলামী সামরিক প্রযুক্তি এবং কৌশলের সীমাবদ্ধতাও প্রকাশ করেছিল। বাইজেন্টাইনদের "গ্রিক ফায়ার" কৌশল ব্যবহার ইসলামী নৌবহরের বিপক্ষে বিশেষভাবে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছিল যখন শহরের বিশাল দুর্গ এবং নৌ পুনরায় সরবরাহের অ্যাক্সেস একটি ঐতিহ্যবাহী অবরোধকে অকার্যকর করে তুলেছিল।[৮] ব্যয়বহুল অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে প্রত্যাহারের বিষয়ে আলোচনা করার জন্য মুয়াবিয়ার আগ্রহ তার বৈদেশিক নীতির প্রতি বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার বোধগম্যতা প্রদর্শন করেছিল যেটি প্রতীকী বিজয়গুলি সম্পদের সীমাহীন ব্যয়কে ন্যায্যতা দিতে পারেনা। অবরোধের ব্যর্থতার পরে আলোচিত শান্তি চুক্তি ইসলামী-বাইজেন্টাইন সম্পর্কের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নজির স্থাপন করেছিল। মুয়াবিয়া বাইজেন্টাইনদেরকে বার্ষিক কর প্রদান এবং সাধারণ শত্রুদের বিরুদ্ধে সামরিক সহায়তা প্রদানে সম্মত হয়েছিলেন যা কার্যকরভাবে বাইজেন্টাইন সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে এবং একটি সাময়িক শক্তির ভারসাম্য স্থাপন করেছিলেন। এই চুক্তি পূর্ববর্তী ইসলামী নীতি থেকে একটি উল্লেখযোগ্য প্রস্থান প্রতিনিধিত্ব করেছিল যা সাধারণত অ-ইসলামী শক্তিগুলির সাথে শ্রদ্ধাজনক সম্পর্ক প্রত্যাখ্যান করেছিল। এই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মুয়াবিয়ার আগ্রহ তার বিস্তৃত বোধগম্যতা প্রতিফলিত করেছিল যে সাময়িক কৌশলগত মিলবন্ধন দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্যগুলি সফল করতে সহায়তা করে। শ্রদ্ধা ব্যবস্থা মুয়াবিয়াকে বাইজেন্টাইন অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং সামরিক সক্ষমতা সম্পর্কে মূল্যবান গোয়েন্দা তথ্যও প্রদান করেছিল। ইসলামী সূত্রগুলি পরামর্শ দেয় যে মুয়াবিয়া আনুষ্ঠানিক শান্তির এই সময়কাল ব্যবহার করে তার নিজের সামরিক বাহিনী বিশেষত, তার নৌ সক্ষমতা শক্তিশালী করার জন্য যখন সম্প্রসারণ নীতি পুনরায় শুরু করার সুযোগের জন্য বাইজেন্টাইন রাজনৈতিক উন্নয়ন সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এস. এম. ইমামুদ্দিন বলেন, মুয়াবিয়া ডাক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন তৎকালীন সময়ে বহির্বিশ্বের সাথে বৈদেশিক সম্পর্ক ঠিক রাখার জন্য, আব্দুল মালিক এটির উন্নতি সাধন করেন এবং আল ওয়ালিদ এর পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার করেন।[৯] এই পদ্ধতি পরিশীলিত কৌশলগত চিন্তাভাবনা প্রদর্শন করেছিল যা তাৎক্ষণিক প্রতিপত্তির চেয়ে দীর্ঘমেয়াদী সুবিধাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। মুয়াবিয়ার বাইজেন্টাইন নীতিতে অভ্যন্তরীণ খ্রিষ্টীয় ধর্মীয় বিভাগের শোষণের প্রচেষ্টাও জড়িত ছিল। অর্থোডক্স বাইজেন্টাইন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মনোথেলাইট খ্রিষ্টানদের প্রতি তার সমর্থন একটি বোধগম্যতা প্রতিফলিত করেছিল যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা সাম্রাজ্যিক ঐক্য দুর্বল করার ক্ষেত্রে মূল্যবান সহযোগী হিসেবে কাজ করতে পারে। একইভাবে সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইনের খ্রিষ্টীয় জনগোষ্ঠীর প্রতি তার তুলনামূলক সহনশীল আচরণ আংশিকভাবে সম্ভাব্য বাইজেন্টাইন প্রজাদের কাছে ইসলামী উদারতা প্রদর্শনের জন্য এক বিশেষ ডিজাইন করা হয়েছিল যার ফলে জনপ্রিয় প্রতিরোধ হ্রাসের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বিজয় সহজতর হয়।

ভূমধ্যসাগরীয় কৌশল

মুয়াবিয়ার বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে একটি পেশাদার ইসলামী নৌ-বাহিনীর উন্নয়ন করে ভূমধ্যসাগরে বাইজান্টাইন নৌ আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করা মুয়াবিয়ার বৈদেশিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল । এই নৌ প্রোগ্রাম ইসলামী কৌশলগত চিন্তাভাবনার একটি মৌলিক পরিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করেছিল এবং সাইপ্রাস, রোডস এবং শেষ পর্যন্ত আইবেরীয় উপদ্বীপে পরবর্তী উমাইয়া সম্প্রসারণের ভিত্তি প্রদান করেছিল। একটি ইসলামী নৌবাহিনী সৃষ্টি উল্লেখযোগ্য প্রাথমিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল। আরব উপদ্বীপের সীমিত নৌ-চলাচল ঐতিহ্য মানে ছিল যে, ইসলামী বাহিনীর কার্যকর নৌ অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং সাংস্কৃতিক পরিচিতি উভয়েরই অভাব ছিল। ভূমধ্যসাগরে শতাব্দী ধরে কার্যকরভাবে একটি বাইজেন্টাইন হ্রদ ছিল যা সাম্রাজ্যিক নৌ ঘাঁটিগুলো সমস্ত প্রধান প্রধান বন্দর এবং কৌশলগত দ্বীপগুলো নিয়ন্ত্রণ করেছিল। এই অসুবিধাগুলি অতিক্রম করার জন্য উল্লেখযোগ্য সম্পদ

বিনিয়োগ এবং নৌ নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের উদ্ভাবনী পদ্ধতি উভয়েরই প্রয়োজন ছিল। এ উদ্দেশে ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা মুয়াবিয়ার শাসন স্থিতিশীল হয়ে গেলে তিনিও ঘরে অধিক উন্নয়নে বিশেষ মনোযোগ দেন।[১০] মুয়াবিয়ার সমাধানে পূর্ব বাইজেন্টাইন নৌ কর্মীদের বিশেষত কপটিক মিশরীয় এবং সিরীয় খ্রিষ্টানদের যারা প্রয়োজনীয় নৌচলাচল দক্ষতার অধিকারী ছিলেন তাদের পদ্ধতিগত নিয়োগ এবং একীকরণ জড়িত ছিল। মুয়াবিয়ার এই নীতি শাসনের প্রতি তার বিস্তৃত পদ্ধতি প্রতিফলিত করেছিল যা প্রযুক্তিগত পদে ধর্মীয় গোঁড়ামির চেয়ে ব্যবহারিক দক্ষতার উপর জোর দিয়েছিল। সংবেদনশীল সামরিক পদে অমুসলিম কর্মীদের ব্যবহার কিছু ইসলামী ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিতর্কিত ছিল কিন্তু মুয়াবিয়া ইসলামী কৌশলগত স্বার্থের জন্য এর প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে এই অনুশীলনকে সফলভাবে রক্ষা করেছিলেন। মুসলিম নৌ বাহিনী ৬৪৯ খ্রিষ্টাব্দে সাইপ্রাস বিজয়ের সাথে তার প্রথম প্রধান সাফল্য অর্জন করেছিল যখন মুয়াবিয়া সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন।[১১] এই বিজয় ইসলামী নৌ অপারেশনের সম্ভাব্য কার্যকারিতা প্রদর্শন করেছিল এবং উভচর যুদ্ধে মূল্যবান অভিজ্ঞতা প্রদান করেছিল। সাইপ্রাস অভিযান বিজিত খ্রিষ্টীয় জনগোষ্ঠীর চিকিৎসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নজিরও স্থাপন করেছিল। মুয়াবিয়া এমন চুক্তি আলোচনা করেছিলেন যা রাজনৈতিক আনুগত্য এবং সামরিক সহায়তার বিনিময়ে অব্যাহত খ্রিষ্টীয় উপাসনার অনুমতি দিয়েছিল। মাস্তুলের যুদ্ধ (৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দ) প্রাথমিক ইসলামী নৌ উন্নয়নের চূড়ান্ত প্রতিনিধিত্ব করেছিল এবং প্রদর্শন করেছিল যে ইসলামী বাহিনী সরাসরি সংঘর্ষে বাইজেন্টাইন নৌবাহিনীকে পরাজিত করতে পারে।[১২] এই বিজয় সমগ্র ভূমধ্যসাগর জুড়ে গভীর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ছিল কারণ বাইজেন্টাইন নৌ অপরাজেয়তার মিথকে ভেঙে দিয়েছিল এবং বিভিন্ন ভূমধ্যসাগরীয় জনগোষ্ঠীকে ইসলামী শক্তির সাথে মিলনের কথা বিবেচনা করতে উৎসাহিত করেছিল। যুদ্ধ মুয়াবিয়াকে উল্লেখযোগ্য নৌ অভিজ্ঞতাও প্রদান করেছিল যা তার পরবর্তী কনস্ট্যান্টিনোপল অবরোধের সময় গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হয়। মুয়াবিয়ার ভূমধ্যসাগরীয় কৌশল কেবল সামরিক উদ্দেশ্যের বাইরে প্রসারিত হয়ে ব্যাপক অর্থনৈতিক এবং কূটনৈতিক লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত করেছিল। ইসলামী নৌ সক্ষমতার উন্নয়ন বিভিন্ন ভূমধ্যসাগরীয় বন্দরের সাথে নিয়মিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের সুবিধা করেছিল, বাইজেন্টাইন অর্থনৈতিক আধিপত্য হ্রাস করার পাশাপাশি ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য নতুন রাজস্ব উৎস প্রদান করেছিল। এই বাণিজ্যিক সম্পর্কগুলি প্রায়ই কূটনৈতিক চুক্তির অগ্রদূত হিসেবে কাজ করেছিল এবং কিছু ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত ইসলামী বিজয়ের দিকে। ৬৬৭-৬৬৮ খ্রিষ্টাব্দে কনস্ট্যান্টিনোপল অবরোধ মুয়াবিয়ার অধীনে ইসলামী নৌশক্তির সম্ভাবনা এবং সীমাবদ্ধতা উভয়ই প্রকাশ করেছিল।[১৩] যদিও মুসলিম নৌবহর সফলভাবে উল্লেখযোগ্য স্থলবাহিনী পরিবহন এবং সরবরাহ করেছিল এটি বাইজেন্টাইন গ্রিক ফায়ার এবং স্থানীয় নৌচলাচল অবস্থার উন্নত জ্ঞানের কাছে দুর্বল প্রমাণিত হয়েছিল। অতঃপর এই অভিযান থেকে পরবর্তী যেকোন ইসলামী নৌ উন্নয়নকে প্রভাবিত করেছিল এবং মুয়াবিয়ার উত্তরসূরিদের অধীনে পরবর্তী ভূমধ্যসাগরীয় অভিযানের শেষ পর্যন্ত সাফল্যে অবদান রেখেছিল।

মধ্য এশিয়ার গোত্রীয় সম্পর্ক

মুয়াবিয়ার বৈদেশিক নীতি শুধুমাত্র প্রধান সাম্রাজ্যগুলির সাথে সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়ার বুখারা, সিজিস্তান, সমরকন্দ ও খোয়ারিজম অঞ্চলে মুসলিম বাহিনী অগ্রসর হয়।[১৪] তুর্কি খাগান ও চীনা সাম্রাজ্যের সাথে মুয়াবিয়ার পরোক্ষ সংঘাত হয়। তিনি কূটনৈতিক দূত প্রেরণের মাধ্যমে এই শক্তিগুলোর সাথে সম্পর্ক স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করেন। মধ্য এশিয়ার রেশম পথ নিয়ন্ত্রণের জন্য এই কূটনৈতিক তৎপরতা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই সম্পর্কগুলি অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পাশাপাশি অব্যাহত সম্প্রসারণ সুবিধা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ গোত্রীয় জোট সামরিক সহায়তা এবং বিজয়ের সম্ভাব্য লক্ষ্য সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য উভয়ই প্রদান করতে পারে। মুয়াবিয়ার

বৈদেশিক নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল মধ্য এশিয়ায় ইসলামি প্রভাব সম্প্রসারণ। আমিরুল মুসলিমিন মুয়াবিয়ার ক্ষমতা সুসংহত হওয়ার পর তিনি বসরায় আব্দুল্লাকে ইবনু আমিরকে গভর্নর নিযুক্ত করে খোরাসান ও সিজিস্তানে অভিযান পরিচালনা করেন।[১৫] এ অঞ্চলটি ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে অত্যন্ত কৌশলগত গুরুত্ব বহন করত। মধ্য এশিয়ায় মুসলিম সম্প্রসারণের প্রাথমিক ঘাঁটি ছিল খোরাসান প্রদেশ। মুয়াবিয়া এই প্রদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা উন্নত করেন এবং এটিকে মধ্য এশিয়ার গভীরে অগ্রসর হওয়ার জন্য একটি শক্তিশালী কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলেন। খোরাসানের গভর্নর হিসেবে তিনি যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়োগ দেন যারা স্থানীয় সংস্কৃতি ও ভাষার সাথে পরিচিত ছিলেন। এই কৌশল স্থানীয় জনগণের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করেছিল। মধ্য এশিয়ার দুটি প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র সমরকন্দ ও বুখারার সাথে মুয়াবিয়া কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। এই শহরগুলো সিল্ক রোডের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এবং পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে কাজ করত। মুয়াবিয়া এই শহরগুলোর স্থানীয় শাসকদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তির মাধ্যমে মুসলিম বণিকরা নিরাপদে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে এবং ইসলামিক সংস্কৃতির প্রসার ঘটে। মধ্য এশিয়ায় বিভিন্ন তুর্কি উপজাতি বসবাস করত। মুয়াবিয়া তাদের সাথে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম হন। তিনি তাদের ঐতিহ্যবাহী জীবনযাত্রার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং একই সাথে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরেন। অনেক তুর্কি নেতা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মুসলিম সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। এই তুর্কি যোদ্ধারা পরবর্তীতে ইসলামিক সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। মুয়াবিয়ার সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার সাথে ইসলামিক রাষ্ট্রের সম্পর্ক প্রধানত বাণিজ্যিক এবং কূটনৈতিক প্রকৃতির ছিল। যদিও এই অঞ্চলে বড় আকারের সামরিক অভিযান তার শাসনামলে সংঘটিত হয়নি তবুও তিনি ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের জন্য ভিত্তিভূমি তৈরি করেছিলেন। সিন্ধু নদীর তীরবর্তী অঞ্চল তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিম প্রবেশদ্বার ছিল। মুয়াবিয়া এই অঞ্চলের রাজা দাহিরের সাথে কূটনৈতিক যোগাযোগ স্থাপন করেন। তার মূল উদ্দেশ্য ছিল এই অঞ্চল দিয়ে ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যিক রুটে প্রবেশাধিকার অর্জন। মুয়াবিয়া সিন্ধুর স্থানীয় শাসকদের কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছান এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রস্তাব দেন। যদিও তাৎক্ষণিক কোন বড় পরিবর্তন হয়নি কিন্তু এই কূটনৈতিক উদ্যোগ পরবর্তীতে উমাইয়া খিলাফতের আমলে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের পথ প্রশস্ত করেছিল। মুয়াবিয়া সম্প্রসারণ নীতির মাধ্যমে সিন্ধুর সীমান্তে তার রাজবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে বুখারা ও ৬৬৭ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে সমরকন্দ জয় করেন।[১৬] মুয়াবিয়া আরব সাগরে মুসলিম নৌবাহিনীর উপস্থিতি জোরদার করেন। তিনি উমান উপকূল থেকে ভারতীয় উপকূল পর্যন্ত নৌপথে মুসলিম বণিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নৌ-টহল ব্যবস্থা চালু করেন। এই নৌ-উপস্থিতি শুধু বাণিজ্যিক স্বার্থেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং এটি ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মুসলিম প্রভাব সম্প্রসারণের একটি কৌশলগত পদক্ষেপ ছিল।দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূল তখন মসলা ব্যবসার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। আরব বণিকরা বহু শতাব্দী ধরে এই অঞ্চলের সাথে বাণিজ্য করে আসছিলেন। মুয়াবিয়া ঐতিহ্যবাহী এই বাণিজ্যিক সম্পর্ককে আরো জোরদার করেন। তিনি মালাবার উপকূলের স্থানীয় রাজাদের সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন করেন এবং আরব বণিকদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করেন। ফলে এই অঞ্চলে বসবাসকারী আরব সম্প্রদায়ের মাধ্যমে ইসলামের প্রাথমিক প্রচার শুরু হয়।

আরবের আঞ্চলিক শক্তিগুলির সাথে সম্পর্ক

আরব গোত্রীয় সম্পর্ক পরিচালনা মুয়াবিয়ার জন্য একটি বিশেষ চ্যালেঞ্জের প্রতিনিধিত্ব করেছিল কারণ তার উমাইয়া বংশ ও সিরীয় শক্তির ভিত্তি ঐতিহ্যবাহী আরব মূল্যবোধ এবং স্বার্থের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে বিভিন্ন গোত্রীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করেছিল। কায়স-ইয়ামান গোত্রীয় বিভাগ যা পরবর্তী

উমাইয়া শাসকদের জর্জরিত করে অতঃপর মুয়াবিয়ার শাসনামল উদ্ভূত হতে শুরু করেছিল কারণ বিভিন্ন গোত্রীয় সংঘ সম্প্রসারণশীল ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে প্রভাব এবং সম্পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল।[১৭] গোত্রীয় সম্পর্কের প্রতি মুয়াবিয়ার পদ্ধতি গোত্রীয় সংহতি বা ধর্মীয় উৎসাহের আবেদনের পরিবর্তে বৈষয়িক সুবিধার বিতরণের উপর জোর দিয়েছিল। গোত্রীয় আনুগত্য সুরক্ষিত করার জন্য ভাতা, ভূমি অনুদান এবং প্রশাসনিক পদের তার পদ্ধতিগত ব্যবহার তার বোধগম্যতা প্রতিফলিত করেছিল যে টেকসই রাজনৈতিক সমর্থনের জন্য কেবল প্রতীকী স্বীকৃতির পরিবর্তে বাস্তব পুরস্কার প্রয়োজন। এই নীতি মুয়াবিয়ার জীবদ্দশায় সাধারণত সফল প্রমাণিত হয়েছিল কিন্তু এমন নজির স্থাপন করেছিল যা তার উত্তরসূরিদের জন্য আর্থিক চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে। খারিজিদের সাথে সম্পর্ক মুয়াবিয়ার কর্তৃত্বের জন্য একটি বিশেষ চ্যালেঞ্জের প্রতিনিধিত্ব করেছিল এবং বাহ্যিক শত্রুদের সাথে তাদের সারিবদ্ধতা প্রতিরোধ করার জন্য সতর্ক পরিচালনার প্রয়োজন ছিল। মুয়াবিয়ার বৈধতা এবং আলীর সমর্থকদের উভয়কেই খারিজিদের প্রত্যাখ্যান ইসলামী রাজনীতিতে একটি সম্ভাব্য তৃতীয় শক্তি সৃষ্টি করেছিল যা পুরো ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করে। মুয়াবিয়ার প্রতিক্রিয়া সামরিক চাপের সাথে আলোচিত মিলনের প্রচেষ্টার সমন্বয় ঘটিয়েছিল যা সম্পূর্ণভাবে সামরিক সমাধানের চেয়ে রাজনৈতিক সমাধানের প্রতি তার পছন্দ প্রতিফলিত করেছিল। মুয়াবিয়ার পূর্ব নীতিতে বিভিন্ন পার্সিয়ান অভিজাত পরিবার এবং মধ্য এশীয় গোত্রীয় সংঘের সাথে জটিল সম্পর্ক জড়িত ছিল। পারস্যের অসম্পূর্ণ ইসলামী বিজয় অসংখ্য স্বায়ত্তশাসিত বা আধা-স্বায়ত্তশাসিত শাসক রেখে গিয়েছিল যারা ইসলামী নীতির উপর নির্ভর করে সম্ভাব্যভাবে মিত্র বা শত্রু উভয় হিসেবে কাজ করতে পারে। মুয়াবিয়ার পদ্ধতি পার্সিয়ান অভিজাতদের ইসলামী প্রশাসনিক কাঠামোতে ক্রমান্বয়ে একীকরণের উপর জোর দিয়েছিল যখন স্থানীয় রীতিনীতি এবং ধর্মীয় অনুশীলন গুলোকে সম্মান করেছিল যেখানে তারা সরাসরি ইসলামী আইনের সাথে সংঘর্ষে যায়নি। মধ্য এশিয়ার তুর্কি জনগণ ইসলামী সম্প্রসারণের জন্য সুযোগ এবং হুমকি উভয়ই প্রতিনিধিত্ব করেছিল। তাদের সামরিক সক্ষমতা বিশেষত, অশ্বারোহী যুদ্ধে তাদের মূল্যবান সম্ভাব্য মিত্র করে তুলেছিল যখন তাদের পশুচারণ জীবনযাত্রা, রাজনৈতিক বিভক্তি কূটনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্কের মাধ্যমে ইসলামী প্রভাবের সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। তুর্কি জনগণের প্রতি মুয়াবিয়ার নীতি প্রত্যক্ষ সামরিক বিজয়ের পরিবর্তে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন এবং বন্ধুত্বপূর্ণ শাসকদের নির্বাচনী সমর্থনের উপর জোর দিয়েছিল।

উত্তর আফ্রিকা ও মাগরেব অঞ্চলের সম্প্রসারণ

মুয়াবিয়ার শাসনামলে ইসলামিক বিজয় উত্তর আফ্রিকায় ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করে। মিশর থেকে শুরু করে তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, আবিসিনিয়া এবং মরক্কো পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ছিল। এই অঞ্চলের বার্বার উপজাতিদের সাথে মুয়াবিয়ার নীতি ছিল সহযোগিতামূলক। তিনি বার্বার উপজাতি প্রধানদের ইসলামিক প্রশাসনে স্থান দেন এবং তাদের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক কাঠামো বজায় রাখার অনুমতি দেন। এই নীতির ফলে উত্তর আফ্রিকায় ইসলামের বিস্তার তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ হয়। যদিও মুয়াবিয়ার নীতি সাধারণভাবে সফল ছিল কিন্তু কিছু বার্বার গোষ্ঠী প্রতিরোধ অব্যাহত রাখে। বিশেষত, উত্তর অঞ্চল থেকে রোমানদের আক্রমণে বিচলিত হয়ে মুয়াবিয়া ৬৭০ খ্রিস্টাব্দে আমরের সেনাপতি উকবা বিন নাফিকে উত্তর আফ্রিকার প্রদেশগুলিতে আরো সম্প্রসারণের জন্য প্রেরণ করেন।[১৮] এটি সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে এবং ইসলামী নীতির ভিত্তিতে করা হয়েছিল। পরে তিনি পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন এবং অবশেষে সমগ্র উত্তর আফ্রিকা দখল করেন। তিনি জোরপূর্বক রোমানদের উচ্ছেদ করেন এবং অঞ্চলটি আরব সাম্রাজ্যের সাথে সংযুক্ত করেন। পরে তিনি আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে তার বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। ৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাইরের আক্রমণের বিরুদ্ধে মুসলমানদের দুর্গ হিসেবে কায়রাওয়ান শহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর কিছুদিন পরেই তিনি উত্তর আফ্রিকায় তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পান

তারপর মুয়াবিয়ার খিলাফতের শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন থাকেন।[১৯] এছাড়া কাহেনা নামে পরিচিত একজন বার্বার রাণী তার নেতৃত্বে আরব বিজয়ের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। মুয়াবিয়া এই প্রতিরোধের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক ও সামরিক উভয় কৌশল ব্যবহার করেন। তিনি স্থানীয় গোষ্ঠীগুলোকে বিভক্ত করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপজাতির সাথে পৃথক চুক্তি করেন এবং প্রয়োজনে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। মিশরের দক্ষিণে অবস্থিত নুবিয়া রাজ্যের সাথে মুয়াবিয়ার সম্পর্ক ছিল কূটনৈতিক প্রকৃতির। পূর্ববর্তী খলিফা উসমান (রা.) এর আমলে স্বাক্ষরিত 'বাক্ত' চুক্তি মুয়াবিয়া অব্যাহত রাখেন। এই চুক্তির অধীনে নুবিয়া প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক দাস ও অন্যান্য পণ্য প্রদানের বিনিময়ে স্বাধীনতা রক্ষা করত। এই চুক্তিটি মুয়াবিয়ার কূটনৈতিক বুদ্ধিমত্তার একটি উদাহরণ। তিনি বুঝেছিলেন যে, নুবিয়ার রুক্ষ ভূমি ও যুদ্ধপ্রিয় জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করার চেয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান অধিক লাভজনক। আবিসিনিয়া (বর্তমান ইথিওপিয়া) এর সাথে মুয়াবিয়ার সম্পর্ক ছিল জটিল প্রকৃতির। লোহিত সাগরের নিয়ন্ত্রণ এবং ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যপথ নিয়ন্ত্রণের জন্য এই অঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মুয়াবিয়া আবিসিনিয়ার বিভিন্ন রাজ্যের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং ইসলাম প্রচারের জন্য শান্তিপূর্ণ মিশনারি প্রেরণ করেন। আবিসিনিয়ার উপকূলীয় অঞ্চলে মুসলিম বণিকদের বসতি স্থাপনের মাধ্যমে মুয়াবিয়া এই অঞ্চলে ইসলামিক প্রভাব বিস্তার করেন। এই নীতি পরবর্তীতে পূর্ব আফ্রিকায় ইসলামের বিস্তারের ভিত্তি তৈরি করে।

বৈদেশিক নীতির পরিমাপ গত অর্থনৈতিক মাত্রা

মুয়াবিয়ার বৈদেশিক নীতির অর্থনৈতিক দিকগুলি তার সামগ্রিক কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল এবং তার বোধগম্যতা প্রতিফলিত করেছিল যে টেকসই রাজনৈতিক সাফল্যের জন্য উল্লেখযোগ্য আর্থিক সম্পদের প্রয়োজন। একটি বিস্তৃত ও বহু-সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যের প্রশাসনের জন্য সামরিক বাহিনী, প্রশাসনিক কর্মীবৃন্দ এবং জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য উল্লেখযোগ্য ব্যয়ের প্রয়োজন ছিল যখন গোত্রীয় এবং আঞ্চলিক আনুগত্য বজায় রাখার প্রয়োজনে বৈষয়িক পুরস্কারের অবিরত বিতরণ প্রয়োজন ছিল। বাইজেন্টাইনদের সাথে প্রতিষ্ঠিত শ্রদ্ধা ব্যবস্থা, রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিত হলেও উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদান করেছিল যা মুয়াবিয়ার গার্হস্থ্য এবং বৈদেশিক নীতির উদ্দেশ্যগুলির অর্থায়নে সহায়তা করেছিল। কনস্ট্যান্টিনোপল থেকে বার্ষিক অর্থপ্রদান, ব্যয়বহুল সামরিক অভিযান বন্ধের সাথে মিলিত অন্যান্য অগ্রাধিকারের জন্য সম্পদ মুক্ত করেছিল যখন ইসলামী কূটনৈতিক নমনীয়তা প্রদর্শন করেছিল। এই ব্যবস্থা বাইজেন্টাইন অঞ্চলের সাথে বর্ধিত বাণিজ্যের সুযোগও প্রদান করেছিল যা ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য অতিরিক্ত রাজস্ব উৎস সৃষ্টি করেছিল। মুয়াবিয়ার নৌ বাহিনী প্রতিষ্ঠা এবং রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয়বহুল হলেও ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্য এবং জলদস্যুতার অবদানের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিকভাবে উপকারী প্রমাণিত হয়েছিল অতঃপর সমগ্র ভূমধ্যসাগরে শক্তি প্রক্ষেপণ করার ক্ষমতা ইসলামী বণিকদের পূর্বে বাইজেন্টাইন এবং ইতালীয় বাণিজ্যিক স্বার্থের একচেটিয়া বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম করেছিল। যা বাইজেন্টাইন বাণিজ্যিক জলযান দখল তাৎক্ষণিক লুটের মাল ও বাইজেন্টাইন অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সামরিক প্রস্তুতি সম্পর্কে দীর্ঘমেয়াদী গোয়েন্দা তথ্য উভয়ই প্রদান করেছিল। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিজিত অঞ্চলগুলির একীকরণের জন্য রাজস্ব নিষ্কাশন সর্বাধিকীকরণে এবং স্থানীয় স্থিতিশীলতা বজায় রাখার মধ্যে সতর্ক ভারসাম্যের প্রয়োজন ছিল। মুয়াবিয়ার বৈদেশিক নীতিতে সাধারণত ইসলামী আইনি ও ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তা ক্রমান্বয়ে প্রবর্তনের সাথে সাথে বিদ্যমান প্রশাসনিক এবং কর ব্যবস্থার ধারাবাহিকতার উপর জোর দিয়েছিল। এই পদ্ধতি অর্থনৈতিক ব্যাঘাত কমিয়েছিল যখন স্থির রাজস্ব প্রবাহ নিশ্চিত করেছিল তবে অমুসলিম জনগোষ্ঠীর আনুগত্য সম্পর্কে সম্ভাব্য দীর্ঘমেয়াদী চ্যালেঞ্জও সৃষ্টি করেছিল। কৃষিনীতি মুয়াবিয়ার অর্থনৈতিক কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের প্রতিনিধিত্ব করেছিল কারণ ইসলামী রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান

জনসংখ্যা এবং সামরিক বাহিনীকে খাওয়ানোর ক্ষমতা কৃষি সম্পদের কার্যকর ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করেছিল। ইরাকে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মিশরীয় কৃষি উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার জন্য উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের প্রয়োজন ছিল কিন্তু টেকসই জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সামরিক সম্প্রসারণের ভিত্তি প্রদান করেছিলেন।

কূটনৈতিক পন্থা উদ্ভাবন এবং প্রশাসনিক উন্নয়ন

মুয়াবিয়ার শাসনামলে ইসলামী কূটনৈতিক অনুশীলন এবং প্রশাসনিক কাঠামোতে উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনের সাক্ষী ছিল যা পরবর্তী শতাব্দীর জন্য ইসলামী আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করবে। এই উন্নয়নগুলি একটি বৈচিত্র্যময় সাম্রাজ্য শাসনের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা এবং একটি জটিল আন্তর্জাতিক পরিবেশে কার্যকর রাষ্ট্রচালনার প্রয়োজনীয়তার প্রতি মুয়াবিয়ার ব্যক্তিগত বোধগম্যতা উভয়ই প্রতিফলিত করেছিল। P.K. Hitti says that, “His prudent mildness by which he tired to disarm the enemy and shame the opposite, his slowness to anger and his absolute self control left him under all circumstances master of the situation” ।[২০] একটি পেশাদার কূটনৈতিক কর্পস প্রতিষ্ঠা মুয়াবিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক উদ্ভাবনের একটি প্রতিনিধিত্ব করেছিল। পূর্ববর্তী ইসলামী নেতারা সাধারণত অস্থায়ী দূতাবাস বা সামরিক কমান্ডারদের মাধ্যমে বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনা করতেন কিন্তু মুয়াবিয়া টেকসই আলোচনা এবং গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে সক্ষম বিশেষায়িত কর্মীদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। এই কূটনৈতিক পেশাদাররা সাধারণত শিক্ষিত শহুরে জনগোষ্ঠী থেকে আকৃষ্ট হতেন এবং প্রায়ই তাদের নির্ধারিত অঞ্চলের সাথে প্রাসঙ্গিক ভাষাগত দক্ষতা এবং সাংস্কৃতিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করতেন। আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক প্রোটোকলের উন্নয়ন আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার সাথে ইসলামী ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তার ভারসাম্য রক্ষা করেছিল। অমুসলিম শাসকদের জন্য উপযুক্ত সম্বোধনের রূপ, নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক অনুশীলনের গ্রহণযোগ্যতা এবং গ্রহণযোগ্য কূটনৈতিক মিলনের ব্যাপ্তি সংক্রান্ত প্রশ্নগুলির জন্য ইসলামী আইনি নীতির সতর্কতা বিবেচনার প্রয়োজন ছিল। এই প্রশ্নগুলির জন্য মুয়াবিয়ার সমাধান এমন নজির স্থাপন করেছিল যা পরবর্তী ইসলামী কূটনৈতিক অনুশীলনকে নির্দেশনা দান করে । গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ মুয়াবিয়ার কূটনৈতিক উদ্ভাবনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রতিনিধিত্ব করেছিল। বিদেশী শক্তিগুলির সামরিক সক্ষমতা, অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে তথ্যের পদ্ধতিগত সংগ্রহ, কার্যকর নীতি প্রণয়ন এবং কৌশলগত পরিকল্পনা সক্ষম করেছিল। গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক কূটনৈতিক কর্মী, বণিক, তীর্থযাত্রী এবং অধীনস্থ জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বেচ্ছাসেবক তথ্যদাতা সহ বিভিন্ন উৎস ব্যবহার করেছিল। বিজিত অঞ্চলগুলির প্রশাসনিক একীকরণের জন্য ইসলামী কর্তৃত্ব বজায় রেখে বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠী পরিচালনায় সক্ষম নতুন সরকারি কাঠামোর উন্নয়ন প্রয়োজন ছিল। মুয়াবিয়ার সকল সমস্যা সমাধান ইসলামী আইন এবং ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তা ক্রমাগত একীকরণের সাথে ইসলামী তত্ত্বাবধানে বিদ্যমান স্থানীয় প্রশাসনিক কাঠামো ধরে রাখার উপর জোর দিয়েছিল। এই পদ্ধতি সাধারণত সফল প্রমাণিত হয়েছিল কিন্তু প্রশাসনিক সুসংগতি এবং ধর্মীয় অভিন্নতা সম্পর্কে সম্ভাব্য দীর্ঘমেয়াদী চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছিল। রেকর্ড রাখা এবং প্রশাসনিক ডকুমেন্টেশন মুয়াবিয়ার শাসনামলে ক্রমবর্ধমান পরিশীলিত হয়ে উঠেছিল যা সাম্রাজ্যিক প্রশাসনের ক্রমবর্ধমান জটিলতা এবং বিভিন্ন সরকারি বিভাগের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা প্রতিফলিত করে। মানসম্মত প্রশাসনিক পদ্ধতি এবং ডকুমেন্টেশন সিস্টেমের উন্নয়ন আরও কার্যকর নীতি বাস্তবায়ন সুবিধাজনক করেছিল যখন পরবর্তী বিশ্লেষণের জন্য মূল্যবান ঐতিহাসিক রেকর্ড প্রদান করেছিল।

ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক

মুয়াবিয়ার বৈদেশিক নীতির ধর্মীয় মতাদর্শগত দিকগুলি ইসলামী ধর্মীয় নীতি এবং ব্যবহারিক রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তার মধ্যে জটিল সম্পর্ক প্রতিফলিত করেছিল। খলিফা হিসেবে মুয়াবিয়া ইসলামী আইন সমুন্নত রাখা ও ইসলামী স্বার্থ প্রচার করার আশা করা হয়েছিল কিন্তু একটি বৈচিত্র্যময় সাম্রাজ্যের শাসনের জন্য নমনীয়তা এবং মিলনের প্রয়োজন ছিল যা কখনও কখনও কঠোর ধর্মীয় ব্যাখ্যার সাথে সংঘর্ষে পড়েছিল। জিহাদের ধারণা মুয়াবিয়ার বৈদেশিক নীতির জন্য একটি কেন্দ্রীয় চ্যালেঞ্জের প্রতিনিধিত্ব করেছিল কারণ ইসলামী ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ সাধারণত খলিফার কাছে ইসলামী অঞ্চল এবং কর্তৃত্বের ক্রমাগত সম্প্রসারণ অনুসরণের প্রত্যাশা করেছিল। তবে ইসলামী সামরিক সক্ষমতার ব্যবহারিক সীমাবদ্ধতা এবং অভ্যন্তরীণ একীভূতকরণের প্রয়োজনীয়তা কখনও কখনও সম্প্রসারণবাদী কার্যক্রমের সাময়িক বন্ধের প্রয়োজন হয়েছিল। মুয়াবিয়ার সমাধান ইসলামী সম্প্রসারণের প্রতি দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতি বজায় রেখে এই ধরনের মিলনের সাময়িক প্রকৃতির উপর জোর দিয়েছিল। ঐতিহাসিক আমির আলী বলেন, মুয়াবিয়া ছিলেন ধূর্ত, ধর্মভয় হীন, তীক্ষ বুদ্ধিসম্পন্ন কৃপণ অথচ প্রয়োজনবোদে অস্বাভাবিক উদার এবং যাবতীয় ধর্মীয় কার্যে বাহ্যিকভাবে নিষ্ঠাবান।[২১] ইসলামী অঞ্চলের মধ্যে অ-মুসলিম জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা মুয়াবিয়ার ইসলামী আইনি প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যবহারিক রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা উভয়ের বোধগম্যতা প্রতিফলিত করেছিল। ঐতিহ্যবাহী ইসলামী ধিম্মা (সংরক্ষিত অবস্থা) ধারণা খ্রিষ্টান এবং ইহুদি জনগোষ্ঠীর একীকরণের জন্য একটি কাঠামো প্রদান করেছিল কিন্তু বিভিন্ন আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর কাছে এই ধারণার প্রয়োগের জন্য স্থানীয় অবস্থা এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তার সতর্ক বিবেচনা প্রয়োজন ছিল। ইসলামী প্রশাসনে ধর্মীয় সংখ্যালগুদের ভূমিকা একটি বিশেষ চ্যালেঞ্জের প্রতিনিধিত্ব করেছিল কারণ তাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা প্রায়ই কার্যকর শাসনের জন্য অপরিহার্য ছিল যখন তাদের ধর্মীয় অবস্থা সম্ভাব্য বৈধতার সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। খ্রিষ্টান প্রশাসক এবং সামরিক কর্মীদের মুয়াবিয়ার ব্যাপক ব্যবহার ধর্মীয় গোঁড়ামির চেয়ে ব্যবহারিক দক্ষতার প্রতি তার অগ্রাধিকার প্রতিফলিত করেছিল কিন্তু এই নীতির জন্য ইসলামী ধর্মীয় কর্তৃপক্ষকে বিচলিত না করার জন্য সতর্ক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন ছিল। ইসলামী ধর্মীয় আইন এবং কূটনৈতিক অনুশীলনের মধ্যে সম্পর্ক অবিরত আলোচনা এবং ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল। নির্দিষ্ট চুক্তির বিধানের গ্রহণযোগ্যতা ও বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের উপযুক্ত আচরণ এবং অ-ইসলামী শক্তিগুলির সাথে গ্রহণযোগ্য মিলনের ব্যাপ্তি সংক্রান্ত প্রশ্নগুলির জন্য কূটনৈতিক কার্যকারিতা বজায় রেখে ইসলামী আইনি নীতির সতর্ক বিবেচনা করা প্রয়োজন ছিল। ইসলামিক রাষ্ট্রের অধীনে বসবাসকারী খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সাথে মুয়াবিয়ার সম্পর্ক ছিল সহনশীল ও বাস্তবধর্মী। তিনি জিম্মি প্রথার অধীনে খ্রিস্টানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেন এবং তাদের গির্জা ও মঠগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। সিরিয়ায় বিপুল সংখ্যক খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব বিবেচনা করে মুয়াবিয়া তাদের প্রশাসনিক কাজে নিয়োগ করেন। বিশেষত, বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য সম্পর্কিত বিষয়ে খ্রিস্টান কর্মচারীদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগান। ইহুদি সম্প্রদায়ের সাথেও মুয়াবিয়ার সম্পর্ক ছিল সহযোগিতাপূর্ণ। তিনি তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতা প্রদান করেন এবং তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদান করেন। ইহুদি বণিক সম্প্রদায়ের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক মুয়াবিয়ার বাণিজ্যিক কূটনীতিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।তিনি জেরুজালেমে ইহুদিদের ধর্মীয় স্থান সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন এবং তাদের ধর্মীয় নেতাদের সাথে নিয়মিত আলোচনা করেন। এই নীতি ইসলামিক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। পারস্য ও মধ্য এশিয়ায় জরাথুস্ট্রীয় সম্প্রদায়ের সাথে মুয়াবিয়ার সম্পর্ক ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সাসানীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর এই সম্প্রদায়ের অনেকেই ইসলামিক শাসনের অধীনে জীবনযাপন করে এবং মুয়াবিয়া তাদের 'আহলে

কিতাব' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে ধর্মীয় স্বাধীনতা দেন।[২২] জরাথুস্ট্রীয় পুরোহিত ও পণ্ডিতদের সাথে মুয়াবিয়া দার্শনিক আলোচনায় অংশ নেন এবং তাদের জ্ঞান থেকে উপকৃত হয়ে এই সম্প্রদায়ের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ইসলামিক প্রশাসনে কাজে লাগে।

আরব বিশ্বে প্রভাব

মুয়াবিয়ার খেলাফতকালে (৬৬১-৬৮০ খ্রিস্টাব্দ) বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরব বিশ্বে যে প্রভাব পড়েছিল তা ছিল বহুমুখী এবং সুদূরপ্রসারী। খেলাফত প্রাপ্তির পর মুয়াবিয়া তার শাসনের প্রথম লক্ষ্য নির্ধারণ করেন অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা স্থাপন এবং সাম্রাজ্যের ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, যা পরবর্তীতে তার আগ্রাসী বৈদেশিক নীতির ভিত্তি হয়ে ওঠে। তিনি দামেস্কে রাজধানী স্থাপনের মাধ্যমে সিরিয়াকে উমাইয়া শক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেন এবং বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে তার বৈদেশিক নীতির প্রধান অংশ করে তোলেন। মুয়াবিয়ার বৈদেশিক নীতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সাথে তার সম্পর্কের জটিল গতিপ্রকৃতি। গৃহযুদ্ধের সময় তিনি বাইজেন্টাইনদের সাথে একটি সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন যা খলিফা আলীর বিরুদ্ধে তার সামরিক অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। তবে খেলাফত লাভের পর তিনি বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে প্রায় বার্ষিক বা দ্বি-বার্ষিক ভিত্তিতে স্থল ও নৌ-অভিযান পরিচালনা করেন যদিও তার শাসনামলের শেষ দিকে তিনি সম্রাট চতুর্থ কনস্টান্টাইনের সাথে একটি ত্রিশ বছরের সন্ধিচুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। যেখানে উমাইয়াদের বার্ষিক স্বর্ণ, ঘোড়া এবং দাস প্রদানের শর্ত ছিল।[২৩] মুয়াবিয়ার সামরিক কৌশলের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল নৌবাহিনী গঠন যা ৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে মনোফিসাইট খ্রিস্টান, কপ্ট এবং জ্যাকোবাইট সিরিয়ান খ্রিস্টান নাবিকদের নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে মাস্তুলের যুদ্ধে বাইজেন্টাইন নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় ভূমধ্যসাগরকে আরব সম্প্রসারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়।[২৪] এই নৌ-শক্তি সাইপ্রাস (৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে) ও রোডস (৬৫৪ খ্রিস্টাব্দে) দ্বীপ জয়ে সহায়তা করে এবং আরব বিশ্বকে ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যের একটি প্রধান শক্তিতে রূপান্তরিত করে। মুয়াবিয়ার শাসনামলে সাম্রাজ্যের আঞ্চলিক বিস্তৃতি উল্লেখযোগ্য ছিল। তিনি উত্তর আফ্রিকায় বিজয় অভিযান শুরু করেন, যেখানে বিখ্যাত সেনানায়ক উকবা ইবনে নাফি ৬৭০ খ্রিস্টাব্দে কাইরুয়ান শহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং ত্রিপোলিতানিয়া ও ইফ্রিকিয়া জয়। পূর্ব দিকে খোরাসানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে মার্ভ ও সিস্তানে দুর্গ শহর নির্মাণ করা হয় ফলে মধ্য এশিয়া এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে অভিযানের ভিত্তি হয়ে ওঠে। মুয়াবিয়ার প্রশাসনিক সংস্কার বৈদেশিক সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। তিনি বাইজেন্টাইন এবং পারসিক প্রশাসনিক পদ্ধতি গ্রহণ করে দিওয়ান আল-খাতাম (রেজিস্ট্রি বিভাগ) এবং দিওয়ান আল-বারিদ (ডাক বিভাগ) প্রতিষ্ঠা করেন, যা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের সাথে যোগাযোগ উন্নত করে এবং বৈদেশিক কূটনৈতিক মিশন পরিচালনা সহজ করে। তিনি বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রসার ঘটান ফলে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা জুড়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ব্যবসায়ী ছিলেন বলে আরবের দীর্ঘস্থায়ী বাণিজ্যিক ঐতিহ্য শরিয়া আইনে সংহিতাবদ্ধ হয় এবং মুয়াবিয়ার শাসনামলে সামুদ্রিক বাণিজ্য নেটওয়ার্ক বিকশিত হয়।[২৫] তার বৈদেশিক নীতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল অমুসলিমদের প্রতি সহনশীল মনোভাব। তিনি বাইজেন্টাইন এবং পারসিক খ্রিস্টান আমলাদের প্রশাসনে নিয়োগ দেন এবং জিম্মি ব্যবস্থার মাধ্যমে খ্রিস্টান, ইহুদি এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেন। তাই সামগ্রিকভাবে, মুয়াবিয়ার বৈদেশিক নীতি আরব বিশ্বকে একটি আঞ্চলিক শক্তি থেকে আন্তর্জাতিক মহাশক্তিতে রূপান্তরিত করে যা পরবর্তী উমাইয়া খলিফাদের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করে।

উত্তরাধিকার এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্য

মুয়াবিয়ার বৈদেশিক নীতি এমন একটি নজির এবং নমুনা স্থাপন করেছিল যা শতাব্দীর জন্য ইসলামী আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করবে। কঠোর মতাদর্শগত আনুগত্যের চেয়ে বাস্তববাদী মিলনের উপর তার জোর অনুরূপ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি পরবর্তী ইসলামী শাসকদের জন্য একটি মডেল প্রদান করেছিল যখন তার কূটনৈতিক এবং প্রশাসনিক উদ্ভাবনগুলি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি করেছিল যা পরবর্তী ইসলামী সম্প্রসারণ এবং শাসনকে সুবিধাজনক করবে। বাইজেন্টিয়ামের সাথে শ্রদ্ধাজনক সম্পর্ক যদিও সাময়িক পরিস্থিতিগত প্রয়োজনে এই ধরনের নমনীয়তা গ্রহণের জন্য ইসলামী ইচ্ছুকতা প্রদর্শন করেছিল। এই নজির পরবর্তী ইসলামী শাসকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হবে যারা উন্নত সামরিক বাহিনীর মুখোমুখি হয়েছিল বা জটিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যা সম্পূর্ণভাবে সামরিক সমাধানকে বাদ দিয়েছিল। মুয়াবিয়ার অধীনে ইসলামী নৌ সক্ষমতার উন্নয়ন পরবর্তী ভূমধ্যসাগরীয় সম্প্রসারণের ভিত্তি প্রদান করেছিল এবং ইসলামকে একটি প্রধান নৌশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। মুয়াবিয়ার শাসনামলে উন্নত কৌশল এবং কৌশল পরবর্তী ইসলামী সাইপ্রাস, রোডস, সিসিলি এবং আইবেরীয় উপদ্বীপ জয় সক্ষম করবে যা মৌলিকভাবে ভূমধ্যসাগরের রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় দৃশ্যপট পরিবর্তন করবে।[২৬] মুয়াবিয়ার প্রশাসনিক উদ্ভাবন বিশেষত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর একীকরণ এবং জটিল আঞ্চলিক সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত শতাব্দীর জন্য ইসলামী শাসনকে প্রভাবিত করবে এমন নমুনা স্থাপন করেছিল। কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে ভারসাম্য, ইসলামী প্রশাসনে অ-মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভূমিকা এবং ধর্মীয় আইন ও ব্যবহারিক শাসনের মধ্যে সম্পর্ক সব কিছুই তার শাসনামলে এমনভাবে সমাধান করা হয়েছিল যা পরবর্তী ইসলামী রাজনৈতিক উন্নয়নকে আকার দেবে। মুয়াবিয়ার শাসনামলে উন্নত কূটনৈতিক প্রোটোকল এবং আন্তর্জাতিক আইন ধারণাগুলি ইসলামী আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নজির প্রদান করেছিল। চুক্তি আলোচনা নিয়ন্ত্রণশারী গুরুত্বপূণ নীতি, বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের আচরণ, ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তা এবং কূটনৈতিক প্রয়োজনীয়তার মধ্যে ভারসাম্য সব কিছুই এই সময়কালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা পরবর্তী ইসলামী কূটনৈতিক অনুশীলনকে প্রভাবিত করবে। যদিও তার বংশানোক্রমিক বা রাজতান্ত্রিক উত্তরাধিকার নীতি বার বার সমালোচনা হয়েছিল যা পরবর্তীতে ইসলামের ইতিহাসে আজও জঘন্যতম ঘটনা।

মুয়াবিয়ার বৈদেশিক নীতির সীমাবদ্ধতা

মুয়াবিয়ার বৈদেশিক নীতি বাস্তবায়নে (৬৬১-৬৮০ খ্রি.) খিলাফতে তাকে অনেকবার অভ্যন্তরীণ বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়েছে বিশেষকরে, হযরত আলীর সমর্থকরা এবং কিছু রক্ষণশীল গোষ্ঠী তার কূটনৈতিক চুক্তি ও বিদেশী শক্তির সাথে সমঝোতার সমালোচনা করেন।[২৭] বাইজান্টাইনদের সাথে অস্থায়ী চুক্তি এবং কিছু ক্ষেত্রে কর প্রদানের বিষয়টি বিতর্কিত ছিল। তিনি এই বিরোধিতা মোকাবেলায় রাজনৈতিক দক্ষতা প্রদর্শন করেন এবং ধৈর্য সহকারে তার নীতির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন। তিনি দেখান যে স্বল্পমেয়াদী ত্যাগ দীর্ঘমেয়াদী লাভের জন্য প্রয়োজনীয়। বিস্তৃত সাম্রাজ্য পরিচালনা এবং একাধিক ফ্রন্টে সামরিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রচুর সম্পদের প্রয়োজন ছিল। মুয়াবিয়াকে সামরিক খরচ ও প্রশাসনিক ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়েছে। এ কারণে তিনি কিছু ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিবেচনায় সামরিক অভিযান স্থগিত রাখতে বাধ্য হন। কর আদায়, বাণিজ্যিক আয় এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগার সমৃদ্ধ রাখার চেষ্টা করেন। এই সীমাবদ্ধতা তার কিছু পরিকল্পনার বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটায়। ইসলামিক সাম্রাজ্যের বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকা এবং বিচিত্র জলবায়ু ও ভূ-প্রকৃতি মুয়াবিয়ার বৈদেশিক নীতি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে। স্পেন থেকে মধ্য এশিয়া এবং মরক্কো থেকে ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় একই নীতি প্রয়োগ করা কঠিন ছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে কেন্দ্রীয় নির্দেশ প্রত্যন্ত অঞ্চলে

পৌঁছাতে দেরি হত। প্রতিকূল আবহাওয়া, পর্বত, মরুভূমি এবং সমুদ্র তথা এ সকল প্রাকৃতিক বাধাগুলো তাকে বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য পৃথক কৌশল প্রয়োগ করতে বাধ্য করে। তবে তিনি এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় স্থানীয় জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগান।

সমসাময়িক পর্যালোচনা

মুয়াবিয়ার জীবদ্দশায় তার বৈদেশিক নীতি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ছিল। সমর্থকরা তার কূটনৈতিক দক্ষতা ও রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা অর্জনের প্রশংসা করতেন। অন্যদিকে বিরোধীরা তার নমনীয়তা ও কিছু ক্ষেত্রে আপস-মীমাংসার সমালোচনা করতেন। বাইজান্টাইন ইতিহাসবিদরা তাকে একজন শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান প্রতিপক্ষ হিসেবে স্বীকার করেন। তারা তার কূটনৈতিক দক্ষতা ও সামরিক কৌশলের প্রশংসা করেন যদিও তারা তার শত্রু ছিলেন। মুসলিম ইতিহাসবিদ ও ফকিহগণ তার শাসনকালকে ইসলামিক রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও সম্প্রসারণের স্বর্ণযুগ হিসেবে মূল্যায়ন করেন। তবে কিছু ধর্মীয় পণ্ডিত তার রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। আধুনিক ইতিহাসবিদরা মুয়াবিয়াকে মধ্যযুগের অন্যতম দক্ষ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে মূল্যায়ন করেন। তার বৈদেশিক নীতিকে তৎকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে একটি বাস্তবসম্মত ও কার্যকর নীতি হিসেবে দেখা হয়। তার কূটনৈতিক পদ্ধতি আধুনিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অনেক নীতির সাথে সাদৃশ্য রাখে। শক্তির ভারসাম্য, অর্থনৈতিক কূটনীতি এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের যে কৌশল তিনি প্রয়োগ করেন তা আধুনিক কূটনীতির পূর্বসূরি হিসেবে বিবেচিত হয়। সমসাময়িক অন্যান্য শাসক, যেমন বাইজান্টাইন সম্রাট দ্বিতীয় কনস্ট্যান্স বা চীনা সম্রাট গাওজংয়ের সাথে তুলনা করলে মুয়াবিয়ার কূটনৈতিক দক্ষতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[২৮] তিনি অপেক্ষাকৃত কম সম্পদ নিয়েও অধিক কার্যকর বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করতে সক্ষম হন। তার সমসাময়িক ইউরোপীয় রাজাদের তুলনায় তার কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অধিক উন্নত ও দূরদর্শী। তিনি জাতীয়তাবাদী সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে একটি বহুজাতিক সাম্রাজ্য পরিচালনার কৌশল উদ্ভাবন করেন।

প্রবন্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সীমাবদ্ধতা

এই প্রবন্ধের মাধ্যমে মুয়াবিয়ার খিলাফতে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য, সাসানীয় সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ, উত্তর আফ্রিকার বারবার উপজাতি সমূহ, আরবের আঞ্চলিক গোত্রসমূহ, মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্য এবং আরব বিশ্বে তৎকালীন কেমন প্রভাব পড়েছিল তার প্রেক্ষাপট ও প্রভাব আলোচনা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য । এছাড়াও এই গবেষণা ক্রমবর্ধমানভাবে ইসলামী সাম্রাজ্য শাসন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপনে পরবর্তীতে শক্তিশালী রাষ্ট্র ও সমাজ বিনির্মাণে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এ প্রবন্ধটিতে ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়েছে। এই প্রবন্ধ গবেষণায় প্রাইমারি সোর্সের অপ্রতুলতা, সেকেন্ডারি উৎস এবং বইপত্রের ঘাটতি বিদ্যমান। তথ্যপঞ্জিতে শিকাগো পদ্ধতি ও বাংলা একাডেমির প্রমিত বানান রীতির প্রয়োগ করা হয়েছে।

উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি যে, মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (৬৬১-৬৮০ খ্রি.) তার খিলাফতে বৈদেশিক সম্পর্ক তথা ইসলামী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং সাম্রাজ্য শাসনের উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। ঐতিহাসিক পি.কে. হিট্টি (P.K. Hitti) মনে করতেন, মুয়াবিয়া প্রথম শুধু প্রথম উমাইয়া খলিফা ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন বিখ্যাত আরব শাসকদের মধ্যে অন্যতম প্রভাবশালী।[২৯] তার শাসনামল প্রাথমিকভাবে আরবীয় ধর্মীয় আন্দোলন থেকে ইসলামী সম্প্রদায়ের একটি প্রধান আন্তর্জাতিক শক্তিতে রূপান্তর প্রত্যক্ষ করেছিল যা বিভিন্ন সভ্যতার সাথে টেকসই মিথস্ক্রিয়া এবং জটিল কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম। বৈদেশিক নীতির প্রতি মুয়াবিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি কৌশলগত

দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মিলিত বাস্তববাদী নমনীয়তা দ্বারা চিহ্নিত ছিল যা তাকে দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্যের সেবায় সাময়িক কৌশলগত মিলন গ্রহণ করতে সক্ষম করেছিল। তার জটিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করার ক্ষমতা যখন ইসলামী সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ বজায় রেখে অভ্যন্তরীণ কর্তৃত্ব একীভূত করা, একটি প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক পরিবেশে ইসলাম বেঁচে থাকা এবং সাফল্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও পরিশীলিত রাজনৈতিক বোধগম্যতা প্রদর্শন করেছিল। মুয়াবিয়ার শাসনামলে কূটনৈতিক অনুশীলন, প্রশাসনিক কাঠামো, সামরিক সক্ষমতার উদ্ভাবন পরবর্তী ইসলামী সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের ভিত্তি প্রদান করেছিল এবং শতাব্দীর জন্য ইসলামী রাজনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করবে এমন নজির স্থাপন করেছিল। ব্যবহারিক রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তার সাথে ইসলামী ধর্মীয় নীতির একীকরণ তার ইসলামী শাসনের জন্য একটি কাঠামো সৃষ্টি করেছিল যা ধর্মীয় বৈধতা এবং রাজনৈতিক কার্যকারিতা বজায় রেখে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এবং জটিল আন্তর্জাতিক সম্পর্কে মিটমাট করতে পারে। তার বৈদেশিক নীতির ঐতিহাসিক তাৎপর্য হলো সপ্তম শতাব্দীর রাজনীতিতে এর তাৎক্ষণিক প্রভাবের বাইরে প্রসারিত হয়ে ইসলামী সভ্যতা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিস্তৃত উন্নয়নে এর প্রভাব অন্তর্ভুক্ত করে। তার বৈদেশিক সম্পর্কের উন্নয়ন কেবল সপ্তম শতাব্দীর মধ্যপ্রাচ্যীয় রাজনীতিতে নয় বরং সেই বিস্তৃত প্রক্রিয়াগুলিতেও মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে যার মাধ্যমে ধর্মীয় আন্দোলন গুলো টেশসই ও আন্তর্জাতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সমসাময়িক গবেষণা ক্রমবর্ধমানভাবে ইসলামী সাম্রাজ্য শাসন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপনে মুয়াবিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করে। তার প্রতিষ্ঠিত নজিরগুলি শাসনামল কেবল রাজনৈতিক একীভূতকরণের একটি সময়কাল নয় বরং ইসলামী রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে একটি মৌলিক রূপান্তরের প্রতিনিধিত্ব করেছিল যা একটি ক্রমবর্ধমান জটিল আন্তর্জাতিক পরিবেশে সম্প্রদায়ের বেঁচে থাকা এবং সম্প্রসারণ সক্ষম করেছিল।[৩০]

তথ্যনির্দেশ ও টিকা

1 P. M. Holt, ed., *The Cambridge History of Islam*, vol. 1 (Cambridge: Cambridge University Press, 1971), p. 77.

2 Aḥmad ibn Yaḥya al-Baladhuru, *Futuḥ al-Buldan*, trans. Philip K. Hitti as *The Origins of the Islamic State,* (New York: Columbia University Press, 1916), p. 242

3 Philip K. Hitti, *History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present*, 10th ed. (New York: Palgrave Macmillan, 2002), pp. 194–195.

4 Muḥammad ibn Jarir al-Ṭabari, *Tarikh al-Rusul wa al-Muluk*, trans. by various scholars as *The History of al-Ṭabari* (Albany: State University of New York Press, 1985–2007), pp. 227–229, 222.

5 Philip K. Hitti, Op Cit, pp. 223–224.

6 Ali Muḥammad al-Ṣallabi, *Tarikh al-Khilafah al-Umawiyyah*, vol. 1, trans. Abdur Rashid Tarapashi (Sylhet: Kalantar Prakashani, 2022), p. 516.

7 Ibn Abd al-Ḥakam, *Futuḥ Miṣr-wa-Akhbaruha: The Conquest of Egypt and Its Chronicles*, ed. Charles C. Torrey, (New Haven: Yale University Press, 1922), p. 217.

8 Ali ibn al-Ḥusayn al-Masudi, *Muruj al-Dhahab*, trans. selections by Allen Cameron and Lawrence Conrad, (Princeton: Princeton University Press, 1993), p.178.

9 S.M. Imamuddin, *Arab Muslim Administration,* (Karachi: Najmahsons press, 1976), p.60.

10 Ali Muḥammad al-Ṣallabi, *Tarikh al-Khilafah al-Umawiyyah*, vol.1, trans. Abdur Rashid Tarapashi, (Sylhet: Kalantar Prakashani, 2022), p. 517.

11 Yaqut al-Ḥamawi, *Mujam al-Buldan*, vol. 1, (Beirut: Dar Ṣadir, 1977), p. 207.

12 Theophanes the Confessor, *Chronographia*, trans. Cyril Mango and Roger Scott as *The Chronicle of Theophanes Confessor* (Oxford: Clarendon Press, 1997), p. 223.

13 Ali Muḥammad al-Ṣallabi, Op Cit, p. 63.

14 Ibid, p. 523.

[15] Abu Jafar Muḥammad ibn Jarir al-Ṭabari, *Tarikh al-Ṭabari,* (Beirut: Dar Ṣadir, 2015), p. 133.
[16] Muhibbudin G. Yusuf, A. F. Ahmed, and A. R. Mustapha, *The Rightly Guided Caliphs and the Umayyads*, (Lagos: National Open University of Nigeria, 2012–2013), p. 75.
[17] Khalid Yahya Blankinship, *The End of the Jihad State: The Reign of Hisham Ibn Abd al-Malik and the Collapse of the Umayyads,* (Albany: SUNY Press, 1994), p. 177.
[18] Muhibbudin G. Yusuf, A. F. Ahmed, and A. R. Mustapha, Op Cit, p. 75.
[19] Muhibbudin G. Yusuf, A. F. Ahmed, and A. R. Mustapha, Op Cit, pp. 75-76.
[20] Philip K. Hitti, Op Cit, p. 197.
[21] Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens,* (Karachi: National Book Foundation, 1979), pp. 24-40
[22] M. A. Shaban, *Islamic History: A New Interpretation: A.D.600-750 (A.H. 132)*, vol. 1, (Cambridge: Cambridge University Press, 1971), pp.82–85.
[23] Julius Wellhausen, *The Arab Kingdom and Its Fall*, (London: Curzon Press, 2000), pp. 104–125.
[24] Philip K. Hitti, Op Cit, p. 195
[25] Fred M. Donner, *The Early Islamic Conquests,* (Princeton: Princeton University Press, 1981), p. 258.
[26] Hugh Kennedy, *The Prophet and the Age of the Caliphates* (London: Longman, 2004), pp. 71–78.
[27] S.M. Imamuddin, Op Cit, p. 63.
[28] G.R. Hawting, *The First Dynasty of Islam: The Umayyad Caliphate AD 661-750*, (London: Croom Helm, 1986), p. 283.
[29] Philip K. Hitti, Op Cit, p. 198.
[30] Musa O. A. Abdul, *The Classical Caliphate,* (Lagos: Islamic Publication Bureau, 1980), p. 81